মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**'র শুভ জন্মদিন উপলক্ষে

কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০

১৭ - ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ । quiz.ideacodebd.com

সিলেবাস

IDeaCode | RWWS

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
পরিচয় ও তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন

সংকলনেঃ নাজমুল হক ডিউক, সাবেক কাউন্সিলর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং সাবেক ছাত্রনেতা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সন্তান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্ম উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন অবসানের বছর ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়ায়। মা ফজিলাতুন্নেসা রেনুর কোল আলো করে আসা হাসুর জন্ম মাকে দিয়েছিলো অপার শান্তি ও স্বস্তি এবং জীবন চলার অনবদ্য প্রেরণা। জন্মক্ষণে, জাতির কল্যাণে পিতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিবারেই শেখ হাসিনা রাজনৈতিক সচেতনতায় বেড়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি, পাকিস্তানি শাসনামলের বৈষম্যনীতি, ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮ এর সামরিক শাসন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সবই ঘটেছে তার চোখের সামনে। তিনি যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি ঢাকায় পরিবারের সাথে মোগলটুলির রজনী বোস লেনের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। পরে মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে ওঠেন। ১৯৫৬ সালে তিনি টিকাটুলির নারী শিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে থাকা শুরু করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

শেখ হাসিনা ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ সালে ড. এম. ওয়াজেদ মিয়ার (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন) সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং ওয়াজেদ মিয়া ৯মে ২০০৯ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন, তাঁদের সংসারে সজীব ওয়াজেদ জয় (পুত্র) ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল (কন্যা) নামে দুই সন্তান রয়েছে।

সজীব ওয়াজেদ জয় হলেন বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি পরামর্শক । ডিজিটাল বাংলাদেশের কনসেপ্ট তাঁর কাছ থেকে আসে। ২০১৭ সালের ইয়াং গ্লোবাল লিডার নির্বাচিত হন সজীব ওয়াজেদ জয় । সায়মা ওয়াজেদ পুতুল একজন প্রখ্যাত অটিজম বিশেষজ্ঞ। সারাবিশ্বে তিনি অটিস্টিক শিশু নিয়ে এবং তাদের অধিকার আদায়ের কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের একজন সদস্য। তিনি একজন স্বীকৃতি প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী।

শেখ হাসিনা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এই কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং এরপর সভাপতি ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ হাসিনা সকল গণ আন্দোলন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ পরিবারের ২৬ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এটি পৃথিবীর ইতিহাসের একটি জঘন্যতম হত্যাকান্ড। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তখন বিদেশে অবস্থান করার ফলে পরিবারে এই দুইজন-ই কেবল প্রাণে বাঁচেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনটি ছিল শুক্রবার। তৎকালীন জার্মানীতে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ড. ওয়াজেদ মিয়াকে বলেন, "আজ ভোরে

বাংলাদেশে ক্যু হয়েছে। আপনারা প্যারিস যাবেন না। রেহানা ও হাসিনাকে একথা জানাবেন না। এক্ষুনি আপনারা আমার এখানে চলেন আসুন" । পরবর্তীতে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও ড. ওয়াজেদ মিয়া সহ তাঁদের সন্তানরা জার্মানীতে চলে যান। পরবর্তীতে ২৫ শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছান শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, ড. ওয়াজেদ মিয়া সহ তাঁদের দুই সন্তান। ভারতে যাওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধির উপস্থিতিতে তাঁরা বাংলাদেশে সর্বশেষ তথ্যে জানতে পারে যে, শেখ পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। এখবর শুনে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধি তখন শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দেন এবং পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে ৬ বছর ভারতে অবস্থান করেন। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে অবশেষে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৮৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার তাঁকে আটক করে ১৫ দিনের জন্য অন্তরীণ রাখে, ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং নভেম্বর মাসে তাঁকে দু'বার গৃহবন্দী করা হয়। ১৯৮৫ সালের ২ মার্চ তাঁকে আটক করে প্রায় ৩ মাস গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে তিনি ১৫ দিন গৃহবন্দী ছিলেন। ১৯৮৭ সালে ১১ নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে একমাস অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৮৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা গ্রেফতার হয়ে গৃহবন্দী হন। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ করা হয়। ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে সংসদ ভবন চত্বরে সাবজেলে পাঠায়। প্রায় ১ বছর বন্দি করে রাখেন। ২০০৮ সালের ১১ জুন তিনি মুক্তিলাভ করেন। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য হামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে তাঁকে লক্ষ করে পুলিশের গুলিবর্ষণ । জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাঁকেসহ তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারী চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে শেখ হাসিনাকে লক্ষ করে এরশাদ সরকারের পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে।

এ ঘটনায় শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও ৩০ জন আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী শহীদ হন। লালদীঘি ময়দানে ভাষণদানকালে তাঁকে লক্ষ করে ২ বার গুলিবর্ষণ করা হয়। জনসভা শেষ করে ফেরার পথে আবারও তাঁর গাড়ি লক্ষ করে গুলি বর্ষণ করা হয়। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন চলাকালে তাঁকে লক্ষ করে গুলি বর্ষণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে তাঁর কামরা লক্ষ করে অবিরাম গুলি বর্ষণ করা হয়। ২০০০ সালে কোটালীপাড়ায় হেলিপ্যাডে এবং শেখ হাসিনার জনসভাস্থলে ৭৬ কেজি ও ৮৪ কেজি ওজনের দু'টি বোমা পুতে রাখা হয়, পরবর্তীতে তা উদ্ধার হয়। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিন্যুয়ে এক জনসভায় বক্তব্য শেষ করার পরপরই তাঁকে লক্ষ করে এক ডজনেরও বেশি আর্জেস গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। সেই হামলায় আইভি রহমানসহ মোট ২৪ নেতাকর্মী নিহত হন। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সেদিন শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে যান। পঙ্গুত্ব বরণ করেন অনেকে। শরীরে স্প্রিন্টার নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন অনেক ত্যাগী নেতা কর্মী।

১৯৯০ সালের স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে তাঁর দল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বামপন্থি দলগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বাধ্য করেন। ঐ বছর ১২ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ২৩জুন তিনি প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তিনি নির্বাচিত হয়ে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কলঙ্কতিলক কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়

করান। তিনি সে সময় শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষিনীতি প্রণয়ন করেন। কৃষিতে ভতুর্কি দিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন। বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চলে বিরাজিত অস্থিরতা - সংঘাত নিরসনকল্পে ১৯৯৮ সালে ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রায় তিন চতুর্থাংশ আসনে জয় লাভ করে। বিজয়ী দলের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে তিনি জানুয়ারী ৬, ২০০৯-এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৫ জানুয়ারী ২০১৪ সালে নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে টানা ২য় বারের মত জয় লাভ করে এবং ১২ জানুয়ারী শেখ হাসিনা তৃতীয় বারের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ(এলডিসি) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ননীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যেকোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি, ১৯০৯ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯।

অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ, যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে। যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখিয়েছে।

জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কারনে এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা , লিঙ্গ সমতা, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয় বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পের প্রসার, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে উন্নয়ন ঘটে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পথে। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ , সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির পরিসংখ্যান নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল

বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আজ প্রতিটি বিভাগে উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি-ই ছিল চোখে পড়ার মত। শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপেসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো - শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষায় সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন , ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"। সম্প্রতি ২০১৯ এর ১৯ আগস্ট দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার অন্তর্ভুক্ত করে "জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯"এর খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। বর্তমানে ১০৪ টি উপজেলার ১৫ হাজার ৮০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল কর্মসূচী চালু আছে এর মধ্যে ৯৩টি উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব স্কুলে শিশুদের উচ্চ পুষ্টির বিস্কুট দেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারী কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট তৈরি হচ্ছে। আজ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হলো ৭ম। স্বাস্থ্যখাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা- ২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে ২হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩ তে ।

স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেরও বেশি জনশক্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবকটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন

পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৪-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধন, বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত নারীদের পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আওয়ামী লীগ সরকারের নজরকাড়া পদক্ষেপ ছিল। একটি বিজ্ঞান মনস্ক ও সৃজনশীল জাতি তৈরির পিছনে বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে ও গবেষণা খাতে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাপ্তি সমুদ্র বিজয়। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার এবং প্রতিবেশী মিয়ানমারের ৭৮৬ কি.মি. এই হিসাব অনুযায়ী ইটলসের রায়ে বাংলাদেশ পেয়েছে ১,১১,৬৩১ বর্গকিলোমিটার এবং সমুদ্রে অবস্থিত ২৮টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকের মালিকানাও পেল বাংলাদেশ। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির উপর ২০১৪ সালের ৭ জুলাই আবারও বাংলাদেশের বিজয় দেখেছে বিশ্ববাসী। এবার প্রতিপক্ষ ভারত। বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলা সমুদ্রসীমা নিয়ে এ বিরোধের অবসান ঘটায় বাংলাদেশ। লাভ করেছে একটি স্থায়ী সমুদ্রসীমা, যার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার। জার্মানীতে অবস্থিত স্থায়ী শালিশি আদালত বাংলাদেশের পক্ষে এ রায় দেন। এ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিপুল অঞ্চল জুড়ে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ১০টি গ্যাস ব্লকের সবগুলোই পেয়েছে বাংলাদেশ।

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। প্রবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকগণ যেতে পেরেছে। এই সরকারের আমলে বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১, ১২ই মে ২০১৮ ভোর ২টা : ১৪ মিনিটে ক্যানেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগ হয় বাংলাদেশ। যোগাযোগ খাতে পদ্মাসেতু নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে শক্তহাতে মোকাবেলা করার সাহস নিয়ে এই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা- ব্রহ্মপুত্র -মেঘনা নদীর অববাহিকায় ১৫০মিটার দৈর্ঘ্যরে ৪১টি স্পান, ৬ হাজার ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থ পরিকল্পনায় নির্মিত হচ্ছে দেশটির সবচেয়ে বড় সেতু। পিপলস এন্ড পলিটিক্স নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের ৫ জন সরকার রাষ্ট্র প্রধানকে চিহ্নিত করেছেন যাদের দুর্নীতি স্পর্শ করেনি, বিদেশে কোনো ব্যাংক একাউন্ট নেই, উল্লেখ করার মতো কোনো সম্পদও নেই। বিশ্বের সবচেয়ে সৎ এই ৫জন সরকার প্রধানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান পিপলস এন্ড পলিটিক্স ৫টি প্রশ্নের উত্তর খোঁজে সৎ নেতার সন্ধান করেছেন। তাতে সর্বমোট ৮৭ নম্বর পেয়ে ৩য় স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরনার্থীদের আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে মাদার অব হিউমিনিটি হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডক্টর অব ল সহ বিভিন্ন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী, আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পদক লাভ করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস্ অব দ্যা আর্থ পদক, আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট পদক, ইউনেস্কো প্রদত্ত হুপো-বোয়ানি শান্তি পদক, ইউএন ওমেন প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পদক, এজেন্ট অফ চেঞ্জ পদক, সাউথ-সাউথ ভিশনারী পদক, ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক, মাদার তেরেসা পদক, নারী ও কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রসারের স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেস্কো শান্তিবৃক্ষ পদক, ইউনেস্কো ইন্টারন্যশনাল লিটারেসি পদক। শেখ হাসিনার রয়েছে সব্যসাচী প্রতিভা, তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'শেখ মুজিব আমার পিতা', 'ওরা টোকাই কেন ?' 'বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', 'দারিদ্র বিমোচন', 'কিছু ভাবনা', 'আমার স্বপ্ন', 'আমার সংগ্রাম', 'আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি', 'সামরিক তন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'সাদাকালো', 'সবুজ মাঠ পেরিয়ে'।

পুরো বিশ্বের ন্যায় কোভিড ১৯ সংক্রমণ বাংলাদেশে প্রথম সনাক্ত হয় ৮ মার্চ,২০২০। তারপর থেকেই প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপ এবং দূরদর্শী চিন্তাভাবনার ফলে কোভিড ১৯ সংক্রমণ কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। সড়কপথ,নৌপথ,আকাশপথে চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ত্রাণতহবিল হতে মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। বিনামূল্যে করোনা রোগী সনাক্তকরণের পরীক্ষা চালু করেন তাঁর পাশাপাশি রোগীদের ফ্রী চিকিৎসা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি প্রতিনিয়ত গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বৈঠক করেন এবং সে সকল অঞ্চলের করনীয় বিষয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনাকালীন সময়ে কৃষকদের ধান কাটায় এবং প্রক্রিয়াজাত করণে সহযোগিতা করেন ছাত্রলীগ সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। এভাবে সকল বিষয়ে সকল দিক উনি নজরে রেখে করোনা মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

করোনাকালীন দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধাপে তিনি প্রনোদনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীর নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন।পরবর্তীতে মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে দেশের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান - কলকারখানা সীমিত আকারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালু করান। ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতায় আমাদের দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

২০১৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে চতুর্থবারের মতো এই বাংলাদেশের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে এবং উন্নয়ন বান্ধব সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারকে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসিয়েছে।

আমরা বর্তমান প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু আমরা তার-ই যোগ্য উত্তরসূরী তার-ই কন্যা শেখ হাসিনাকে দেখেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি স্বনির্ভর ও উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের সেবা আজ সর্বত্র। ২০২১ সাল ও ২০৪১ সালের যে পরিকল্পনা নিয়ে উনি কাজ করে যাচ্ছেন, আমরা বর্তমান প্রজন্ম এই পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে এবং সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গিমুক্ত তথা নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়ে কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।